Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.4
Pages	99-118
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য

Check for updates

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

এক

বাঙলা ও উর্দু গদ্য প্রায় সমবয়স্ক; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' কথা ধরলে বাঙলা গদ্য কিছুটা বড়ই হবে। এই দুই ভাষায় গদ্যসাহিত্যের প্রসার কিন্তু এক পথে হয়নি। বাঙলা গদ্যের গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্যাস-নাটক ও রম্য রচনার প্রাচুর্যে, ভাবসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে, আর উর্দু স্বকীয়তা অর্জন করেছে তার তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক ও তত্ত্ববহুল রচনার সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে। যেমন কাব্যে, তেমন গদ্যেও ফার্শি সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই উর্দু সম্পদশালী হয়েছে। তাই বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি ও রচনারীতির classical tradition উর্দুকে যেমন প্রাণশক্তি ও ঐশ্বর্য দিয়েছে বাঙলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। বাঙলা কথাসাহিত্যের আদি প্রেরণা ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজি সাহিত্যের চিন্তা ও প্রকাশরীতি। পাশ্চাত্য রীতির আদর্শ উৎসাহের সঙ্গেই বাঙলা গদ্য মেনে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য বাঙলা গদ্যের প্রসাদগুণ ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি বা সাহিত্যরুচির নিয়ামক হতে পেরেছে কি না সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক traditionকে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে বাঙালী যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে অনুশীলন করে এসেছে, বাঙলা গদ্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন সে অনুপাতে হয় নি।

বাঙলা দেশের মত সমুদ্রমুখি অঞ্চলে উর্দুর প্রসার হলে তাতেও হয়ত সমুদ্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বাঙলার মতই সমন্বিত হোত। কিন্তু উর্দুভাষী অঞ্চল সমুদ্র থেকে দূরে ত বটেই, সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত সে অঞ্চল ইয়োরোপীয় বাণিজ্য ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তেও পারে নি। উত্তর ভারতের সামাজিক কাঠামো ও চিন্তাপ্রণালীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সে অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও সাম্প্রতিক, প্রায় বিশ শতকীয়। বাঙলা, তামিল, মারাঠীর মত উর্দুকে Classical tradition

ইতিহাসের তথ্যের মত আবিষ্কার করতে হয় নি; উর্দু ভাষী উত্তর ভারতের মানসিকতায় সে ঐতিহ্য-ই ছিল জীবন্ত আদর্শ। ফার্শি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি যেমন অনুকরণ ও অনুবাদের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনই তার প্রকাশরীতি, রুচি ও বিষয়বস্তু উর্দু সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্যার সৈয়দের উৎসাহে যখন ইংরাজি শিক্ষিতরাও উর্দু গদ্যের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, তখনও ফার্শির এই সর্বাত্মক প্রভাব অব্যাহতই ছিল। উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সংক্রমণ উর্দুতে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাও শুধু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে। বামপন্থী উর্দু সাহিত্য থেকেও ফার্শি Classicismএর জের এখনও যায় নি।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত ফার্শি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। ইতিহাস-সচেতনতা মুসলমান মানসেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ফার্শির মাধ্যমে এই মানসিকতা যে সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে আরবীর মতই তা বিপুল ও বিচিত্র। রোম্যান্টিক উপাখ্যান, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি বাদে ফার্শি গদ্য সাহিত্যের প্রায় সবটাই ইতিকথা, জীবনী, নীতিমূলক পুরাতত্ত্ব ও রাজন্য-কাহিনী। ফার্শি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি রাজকেন্দ্রিক, এবং রচনাগুলি উপাখ্যানধর্মী; ঘটনার ব্যাখ্যার চেয়ে বিস্তৃত বিবরণের প্রতি বেশী মনোযোগী। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের অর্থ রাজা বা ব্যক্তির কীর্তিকাহিনী। ফার্শি ইতিহাসগুলির গঠন তাই প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক (dynastic) কিংবা জীবনীমূলক (biographical)। ইসলামের শক্তি ও সভ্যতার স্বর্ণযুগে ফার্শি ইতিহাসের মনোভঙ্গি তৈরী হয়েছিল বলে অমুসলমান জগৎ বা যুগের প্রতি ঐতিহাসিকদের অলস কৌতূহল কিছুটা ছিল বটে, শ্রদ্ধা বা অনুসন্ধিৎসা তেমন জাগে নি। বিশ্বের ইতিহাস-জাতীয় রচনাগুলিও ইসলামের আবির্ভাব ও মুসলিম জগতকে কেন্দ্র করেই লিখিত হোত। ফলে, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণে ইসলামের মূল্যমানই ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আরবদের প্রভাবে ফার্শি ইতিহাসগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল, তার দরুণ কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত-গ্রন্থকারদের বিবরণ ও জীবনী সম্বলিত এক ধরণের bio-bibliographical রচনা আরবী-ফার্শী ভাষায় গড়ে উঠেছিল যার নজীর মধ্যযুগের কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। বলা চলে যে, মুসলমানদের ইতিহাস চেতনা সাধারণতঃ রাজবৃত্ত ও সাহিত্যকর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছে। ভূগোল, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, আইন-কানুন, বিজ্ঞান ইত্যাদি

বিষয়ে ফার্শিতে প্রচুর রচনা আছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা দেখান সে সব রচনার লক্ষ্য নয়। কাব্য, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিবর্তনের মূলে কোন নৈর্ব্যক্তিক বা সামাজিক কারণ থাকা সম্ভব, ফার্শি ইতিহাসকার (এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। ব্যক্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবর্তনের মূলে আকস্মিকতা থাকে, প্রাচীন গ্রীকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আরবী, ফার্শি ইতিহাসগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত বিষয়বস্তুর উত্তরাধিকার নিয়ে উর্দু ভাষায় ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। প্রথম পর্বের রচনাগুলি প্রায় সবই ফার্শি ইতিহাসের তর্জমা, নয়তো সারসঙ্কলন। ১৮০৪ সালে Fort William Collegeএর মীর শের আলী আফসোস আঠারো শতকের লেখা সুজন রায়ের ফার্শি ইতিহাস 'খুলাসাতুত-তওয়ারিখের' যে সারানুবাদ 'আরায়েশে মাহফিল' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন তাকেই উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত মৌলিক ইতিহাস রচনার রেওয়াজ তেমন প্রসারলাভ করেনি তার জন্য ফার্শির ব্যবহার অব্যাহত ছিল বহুদিন পর্যন্ত। ১৮৭২ সালে যখন তথ্য ও তত্ত্ববহুল (serious) বিষয়ের জন্য উর্দু গদ্যের বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়েছে তখনও, ভুপালের নবাব সেকান্দার বেগম তাঁর 'ভুপালের ইতিহাস' উর্দুতে রচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি: উর্দুর সাথে তার একটা ফার্শি সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। Methodology ও তথ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যুগের রচনাগুলি মধ্যযুগীয় ফার্শি ঐতিহাসিকতারই ভাষান্তরিত রূপ। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ-ইতিবৃত্তের উদ্ধার ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি এশিয়ার ইতিহাসে প্রযুক্ত হচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয়ের স্বাক্ষর এযুগের ফার্শি ও উর্দু ঐতিহাসিকদের নাই বললেই চলে। লিখিত বিবরণের উপর একান্ত ভাবে ভরসা করা, প্রত্নতত্ত্ব ভূগোল, ভাষা, সমাজ ও অর্থনীতির আলোকে সে বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই না করে তাকে নির্ভুল তথ্য হিসাবে ব্যবহারের রীতি ফার্শি ইতিহাস থেকে উর্দুতে সঞ্চারিত হল। বিশ্ব মানবের ইতিহাসকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে শুধুমাত্র আরবী-ফার্শি ইতিবৃত্তের মুসলমান-কেন্দ্রিক ঘটনা গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে

গেল। ইতিহাসের গতি ও মর্মোপলব্ধির গভীরতা সেজন্য উর্দু'তে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। উত্তর কালে যখন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ আরম্ভ হলো, তখনও ফার্শি ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ের তথ্যসম্ভার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তার ব্যবহার হয়, ইতিহাসের সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়ার জন্য নয়।

দুই

উর্দু'তে মৌলিক ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধহয় সৈয়দ আহমদ খানের (পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান) ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'আসারুস-সানাদীদ' নামক রচনাটি। এ গ্রন্থটি রাজোপাখ্যান নয়; শিলালিপির নকলসহ দিল্লীর পুরাতন ইমারতগুলির সচিত্র ঐতিহাসিক বিবরণ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এ বইটি পথিকৃতের দাবী রাখে। ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হওয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বের লেখা এই বইটি সে সময়েই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ আহমদের জীবদ্দশাতেই এর ফরাসী তর্জমা হয়, এবং কলিকাতা ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি লেখককে 'অনারারি ফেলো' নির্বাচিত করে সম্মানিত করে। যে অপরিসীম শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখক একাই সে সময়ের শ্বাপদসঙ্কুল জীর্ণ ইমারতগুলি পর্যবেক্ষণ ও শিলালিপিগুলির নকল করেছিলেন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। সৈয়দ আহমদ ইংরাজি জানতেন না, তবে দিল্লীর ইংরাজ মহলে তাঁর বন্ধু বান্ধব ছিল, এবং মূল উপাদান পরীক্ষা করার এই আগ্রহ সম্ভবতঃ ইংরাজ সংস্পর্শেরই ফল।

তা সত্ত্বেও এ বইটি ফার্শি ইতিহাসের প্রভাব এড়াতে পারেনি। বইটির শেষাংশে দিল্লীর কবি-সুফী-শিল্পী-পণ্ডিত প্রভৃতি বিদগ্ধ সমাজের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহ আদর্শায়িত জীবন-বৃত্তান্ত ও গুণকীর্তনের এই পরিচ্ছেদটি পরে অবশ্য তাঁর বন্ধু, মুদ্রাতাত্ত্বিক Edward Thomas এর পরামর্শমত ১৮৫৪ সালের সংস্করণ থেকে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছিলেন। এ ধরণের বিবরণ মোগল আমলের ফার্শি ইতিকথাগুলির অপরিহার্য অংশ ছিল। এর পূর্বে সৈয়দ আহমদ ফার্শিতেও একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন 'জাম-এ-জম' নামে, যাতে তৈমুর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোগল বাদশাদের

জন্ম-মৃত্যু, সিংহাসন আরোহণ, শাসনকাল ও বিশেষ ঘটনার তারিখের তালিকা আকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল। এটিও মধ্যযুগীয় ফার্শি ইতিহাসের এক বিশেষ রচনারীতির সাক্ষাৎ ও সজ্ঞান অনুকরণ।

পাশ্চাত্য methodologyর সাথে সৈয়দ আহমদের পরিচয় অবশ্য পরে আরও গভীর হয়েছিল। ফার্শির মূল ঐতিহাসিক পুঁথিগুলির নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশে তাঁর যত্ন ও শ্রমস্বীকার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে লখ্‌নৌ থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে 'আইন-এ-আকবরী'র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং ১৮৬২ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য 'তারিখ্‌-এ-ফিরোজ শাহী' সম্পাদনা করেন। দু'বছর পরে, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী'রও একটি সংস্করণ তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় লিখিত উপাদানকে পাশ্চাত্য রীতিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাকে পুনর্বিচার করার দৃষ্টান্তও আছে তাঁর 'খুতবাত-এ-আহমদীয়া' নামক ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হজরত মুহম্মদের জীবনীসংক্রান্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। এটি আসলে Sir Wm. Muirএর সদ্য প্রকাশিত 'Life of Mohammad' এর সমালোচনা। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে মুসলমান রচিত গ্রন্থে বর্ণিত হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিচার করে সৈয়দ আহমদ Wm. Muirএর বক্রোক্তির জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। হজরতের চরিত্রে ও কার্যকলাপে অলৌকিকতা আরোপ করে মুসলমান লেখকরা যা বলেছেন, তার সবই আক্ষরিকভাবে সত্য, এমন মনে করার কোনও হেতু নাই, বরঞ্চ আতিশয্যের ভাষা হিসাবেই সে বর্ণনাগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রতীকে বর্ণিত সূক্ষ্মতত্ত্বকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের (Natural Science) ইন্দ্রিয়ানুভূত স্থূল তথ্যের মত ধরে নিয়ে খৃষ্টান পাদরীরা মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করার যে সুযোগ তৈরী করে নিয়েছিল সৈয়দ আহমদের এই লেখাটি তার প্রথম যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ। মুসলমান লেখকদের মানসাভ্যাস ও তাদের লেখায় পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে সমকালীন ইয়োরোপীয় Humanismএর আদর্শে, হজরতের মানবতার উপর জোর দিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন তাঁর চরিত রচনার নমুনা হিসেবে।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে সৈয়দ আহমদ খানের দান অপরিমেয়। মৌলিক ইতিহাস অবশ্য তিনি লেখেননি, এবং ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বও তেমন

নাই। তবে, সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনি সূত্রপাত করেন, তাঁর অনাড়ম্বর গদ্যরীতি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের কৌশল উর্দুতে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা সহজতর করে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত সৈয়দ আহমদের নিজের লেখা দুইটি পুস্তিকা 'আসবাব-এ-বাগাওয়াত' আর 'ওয়াকিয়াত-এ-বিজনৌর' এই নূতন রীতিতে সমকালীন ইতিহাস রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতিহাসের যে ধারণা (Conception) এই নূতন রীতির গদ্যে ও তথ্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ হতে থাক্‌ল তা অবশ্য মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের ঐতিহ্য অনুসারী অর্থাৎ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বর্ণনাত্মক (narative) ও উপদেশমূলক (didactic)। রাজৈশ্বর্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য ও শিল্পকীর্তি এইরূপ কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে রাজবংশের উত্থান পতনে পার্থিব সম্পদের নশ্বরতা ও কালচক্রের অমোঘ গতি নির্দেশ করার দিকে প্রবণতা এই ঐতিহ্যের প্রধান লক্ষণ। সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিবাদ এ মনোভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর অনুসৃত আলীগড় আন্দোলনের সুযোগে এ মনোভাব আরও পুষ্ট ও সৃজনক্ষম হোল। উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্য তার প্রসার, গভীরতা ও নির্দেশের (direction) জন্য এই আন্দোলন-প্রসূত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দীপনার কাছে যতটা ঋণী উর্দু সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা তেমন ঋণী নয়। উর্দু ঐতিহাসিকদের চিন্তাবৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে সে আন্দোলনের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। সে জন্য আলীগড় আন্দোলনের মূল চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন।

তিন

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ইংরাজ শাসনের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের একটা আপোষ মীমাংসার আশু প্রয়োজন থেকে এ চিন্তাসূত্রের উদ্ভব হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় ওহাবীদের সংগ্রামী প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না। একদিকে অভিজাতরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছিল। আর অন্যদিকে শিক্ষক-উকীল-আমলা-চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের জীবিকার ক্ষেত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রাধান্যের ফলে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা দেশের হিন্দুরা ইংরাজের

উপর আস্থা স্থাপন করে যে সহযোগ ও আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরও সেই একই নীতি গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টান শাসনকে গ্রহণ ও তার সঙ্গে সহযোগের মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে জাগাতে হলে অবশ্য তাদের মনের অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে নূতন পথে চালিত করা প্রয়োজন। একটি সম্প্রদায়কে তার অভ্যস্ত চিন্তা-রীতি ও কর্মপদ্ধতির ঐতিহ্য ছাড়াতে হলে শুধু নূতন চিন্তাসূত্র (set of ideas and principles) ও দিক্‌দর্শনেরই প্রয়োজন নয়, তার সঙ্গে পরম আত্মপ্রত্যয়, একটি অনন্যতাবোধ ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল।

সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টা যুগের এই দাবীকেই রূপ দিয়েছিল। একদিকে তিনি মুসলমান সমাজে ইংরাজ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূল মনোভাব তৈরী করতে চেষ্টা করেন। আর অন্য দিকে মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতক মনে করার যে অভ্যাস ইংরাজ সরকার মহলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা দূর করতে সচেষ্ট হন। ইংরাজ শাসন ও সভ্যতার আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে রাজনীতি, শাস্ত্র, সমাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে যুক্তি সংগ্রহ করে চিন্তা ও আচরণের যে আদর্শ তিনি প্রচার করেন—তাতে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নৈতিক ভিত্তি রচিত হোল। এই আদর্শ সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যমান থেকে সঙ্কলিত; যেখানে এর সঙ্গে মুসলমানের অভ্যস্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানেই সৈয়দ আহমদ কোরানের সূত্র ও ইতিহাসের তথ্যকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনর্ব্যাখ্যা করে ইসলামের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। নূতন আদর্শ প্রচারের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মুসলমানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব সাধিত হোল—চিন্তা ও কর্মের নানাক্ষেত্রে এখনও তার স্বাক্ষর রয়েছে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই আন্দোলনের দ্বারা সৈয়দ আহমদ ইসলাম ও মুসলমান সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় (intellectual method) সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে জীবনবেদের মত ব্যবহার করে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের মুসলমান সমাজ মধ্যবিত্তরূপে গঠিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে।

ঐতিহাসিক চিন্তার দিক দিয়ে আলীগড় আন্দোলন তেমন কোনও নূতন ভাবনা বা সূত্রের প্রবর্তন করতে পারেনি। গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক ন্যায়

বিচার (Social Justice) প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে আন্দোলনের motive forceএ তেমন যোগ ছিলনা বলেই হয়ত সে যুগের উর্দু ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে এসব ভাবনার স্বীকৃতি বা গভীর প্রতিফলন দেখা যায় না। সৈয়দ আহমদের এক প্রধান সহকর্মী এবং উত্তরকালে এ আন্দোলনের নেতা মৌলুবী মুশতাক্ হোসেন (পরে, নবাব ভিকারুল মুলক্) ১৮৭২ সালে ইংরাজি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বইটির ৩।৪টি সংস্করণ হয়েছিল। এবং লেখকও সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এতে ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা না করে রাজবংশের পতনকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মন্ত্রের উল্লেখ আছে অবশ্য তথ্যের মত, কিন্তু তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা নাই। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "মানব কীর্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখিয়ে পাঠকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্য এ ইতিহাস লেখা হলো। এই পুস্তক থেকে আরও প্রমাণ হবে যে জননী শিক্ষিতা হলে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন কত সহজ ও কত ভালভাবে হতে পারে।"[১]

প্রায় ৭০ বৎসর আগে মির্জা আবু তালেব খান নামক মুর্শিদাবাদ দরবারের অবসর প্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত ফার্শিতে লিখেছিলেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পর ইয়োরোপ গিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের First Consul থাকাকালে লণ্ডন থেকে প্যারিস গিয়ে দ্বিতীয় Consul Tallyrand এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও পেয়েছিলেন। লণ্ডনে থাকা কালেও তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সাথে মেলা মেশা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা জানার ও তার তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করার ঘনিষ্ঠ সুযোগ তিনি যতটা পেয়েছিলেন এশিয়ার আর কোনও লেখক তেমন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। অথচ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ বিপ্লবের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে ফ্রান্সের রাজপরিবার ও অভিজাতদের দুর্গতি ও প্রজাদের নৃশংস আচরণের কাহিনীই বেশী, বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় নাই।[২]

ইতিহাসকে এই ভাবে নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপায় রূপে দেখায় মধ্যযুগীয় রীতির তেমন পরিবর্তন আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ দিক (aspect) ও চিন্তাসূত্রগুলি নবাবিষ্কৃত

ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিণত হবার সুযোগ পেল মাত্র। ফার্সি ইতিহাসগুলিতে মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের সাম্রাজ্যলিপ্সার কোনও নিন্দা ত' থাকতইনা, রাজধর্মের নামে বিজয়ীদের অকুণ্ঠ সমর্থন-ই করা হতো। এ মনোভাবের যতটুকু ব্যতিক্রম উর্দু ইতিহাসে দেখা গেল তা উনিশ শতকের উপযোগী যুক্তির অবতারণায়। ইংরাজরা তাদের উপনিবেশ-নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যেমন শ্বেতজাতির সভ্যতাবিস্তারের গুরুদায়িত্বের দোহাই পাড়ত, উর্দু ঐতিহাসিকরাও তেমনই অতীতের মুসলমান সাম্রাজ্যগুলিকে সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারের সহায়ক রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সমাজ ইংরাজ ব্যবস্থায় যে সব সুবিধা ভোগ করছিল, তার অংশীদার হওয়ার দাবী থেকে আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে বলে এর ঐতিহাসিক চিন্তারীতিতে হিন্দুদের প্রতি বিরোধ, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব অবচেতন ভাবেই জমে ওঠে। এ চিন্তা-রীতির রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ইংরাজের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা, কিন্তু এর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হোল ইসলামের নীতি ও কীর্তিকে পাশ্চাত্য মূল্যমান অনুযায়ী ব্যাখা ও প্রচার করা। তাই মুসলমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুসলমান বা ভারতীয় উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যেমন অভ্যাসে পরিণত হোল, তেমনই বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাথে যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের যোগ আবিষ্কার করা যায়, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ধর্ম সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মুসলমানকে তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান অধঃপতন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার প্রেরণা এই ভাবে উর্দু লেখকদের ঐতিহসিক চিন্তার স্থায়ী লক্ষণ হয়ে রইল।

১৮৭৯ সালে আলতাফ হোসেন হালীর সুবিখ্যাত 'মুসাদ্দাসে' এই মনোভাব সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, যাতে বিশ্ব-মুসলিম শক্তির উত্থানপতনের কাহিনী আবেগময় কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছিল। সমাজের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে ইতিহাসের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার জন্য এ কাব্যটি সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং লক্ষণীয় এই যে, উর্দুভাষীদের মধ্যে সে জনপ্রিয়তা আজও কমেনি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখার রীতি এ সময়ে উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকল তার স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা 'শেকোয়-এ-হিন্দে', যার আবেগের আন্তরিকতা মুসলমান সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে ইঙ্গিত কবিতাটির প্রস্তাবনাতেই

আছে : "হে চিরবসন্তের দেশ হিন্দুস্থান, বিদায়! বিদেশ থেকে এসে বহুদিন তোমার আতিথেয়তা ভোগ করে গেলাম"। 'হজরত মুহম্মদের দরবারে আর্জি' এই শিরোনামায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা আছে যার প্রথম ক'টি লাইনে ভারতের দুর্গত মুসলমানদের দিকে হজরতকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানান হয়েছে কেননা, "যারা একদিন স্বদেশ থেকে মহা সমারোহে বেরিয়ে দিকে দিকে তাঁর জয় ঘোষণা করেছিল, আজ তারা বিদেশ বিভুঁয়ে অনাত্মীয়ের মধ্যে দীনহীনভাবে পড়ে রয়েছে"।

এই ঐতিহাসিক মনোভাবের দু'টি ফল অনিবার্য ছিল। ভারতবর্ষ যে মুসলমানের দেশ নয়, এ অনুভূতি প্রসারের ফলে ভারত-ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণে বা তার সাথে আত্মীয়তাবোধে অনিচ্ছা, আর তারই সঙ্গে ইসলামের জন্মভূমি ও বিশ্ব-মুসলিমের সমৃদ্ধির যুগের প্রতি মুসলমানের টান নিরন্তর বাড়তে লাগল। ইসলামের সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই Extra-territorialism উর্দুভাষী মুসলমানদের মনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবার ফলে প্যান্ ইসলামের আদর্শ তাদের মনে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেল। মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির জীবন্ত প্রতীক হিসাবে তুর্কীর খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভাব এই কারণে এত বেড়ে গেল যে, উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে সুলতান আবদুল হামীদের নামে খুতবা পড়ার কথাও ব্রিটিশ সরকারের কানে এল। প্যান ইসলামের বিখ্যাত মন্ত্রগুরু জামালুদ্দিন আফগানি এ সময়ে কিছু দিনের জন্য ভারতে নজরবন্দি হয়ে বাস করেছিলেন—তাঁর প্রভাবে এ উদ্দীপনা এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল যে আলীগড় আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক আদর্শ—ইংরাজ সরকারের উপর অবিচলিত ভক্তি—সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল এবং এই পরিণতি রোধ করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদকে প্যান্ ইসলামের বিরোধিতাও করতে হয়েছিল।[৩]

চার

এ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা অবশ্য তেমন বেশী নয়। মুসলমানের অতীতকে কীর্তিগাথা ও নীতিমূলক জীবনচরিতের (commemorative and didactic) মাধ্যমে উপস্থিত করা এসব রচনার প্রধান রীতি। জীবনচরিতের বিষয় নির্বাচনে ও গুরুত্ব আরোপনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল মাপকাঠি। যেমন হালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইনি কবি গালিব ও শেখ সাদীর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এঁর রচিত স্যার সৈয়দের জীবন চরিত 'হায়াত্-এ-

জাবেদ' উর্দুর ঐতিহাসিক জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান। ইতিহাস চেতনাকে এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ দেওয়ার ফলে উর্দু ভাষায় জীবন চরিত ও আত্মজীবনী রচনা যত প্রচুর সংখ্যায় হয়েছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

উর্দুতে ইতিহাসের এই রূপায়ন ও মানোন্নতি সাধনে আলীগড় কলেজের অধ্যাপক শিব্‌লী নোমানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাঁর ইতিহাস সচেতন রচনাগুলিই মুসলিম কীর্তির তথ্যনির্ভর মূল্যায়নে দিক্‌নির্দেশ ও গতিসঞ্চার করেছিল। শিবলীর মন ছিল কাব্যধর্মী কিন্তু তাঁর গভীর ইতিহাসবোধ ছিল। তিনি ইংরাজি জান্‌তেন না এবং ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রধান পুরাতন শিক্ষারীতিতে তাঁর মানস গঠিত হয়েছিল। তাঁর চোখে, সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের সংস্কৃতিবোধের ক্রমবিকাশই হোল ইতিহাসের একমাত্র অন্বিষ্ট, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মানুভূতি যার শক্তির মূল উৎস। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক T. W. Arnold তাঁকে পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতি ও আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বটে, কিন্তু একমাত্র বিবর্তনবাদ (Evolution) ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক ধারণায় পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর আর কোনও প্রভাব তেমন লক্ষণীয়ভাবে পড়েনি। তাঁর চিন্তায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক Carlyleএর আদর্শবাদের, বিশেষ করে Heroes and Hero-worshipএর, সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় যার একটি আরবী তর্জমা তিনি পড়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে শিবলী দুইখণ্ডে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের জীবন চরিত প্রকাশ করেন। আল-মামুনের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন তা নয়; সে যুগের সাংস্কৃতিক গৌরবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "হারুনল-রশীদ যদি বারমাক বংশের হত্যায় লিপ্ত না থাক্‌তেন তাহলে এ গ্রন্থের নায়ক হিসাবে তাঁকেই আমি নির্বাচন করতাম।"[৪] তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার ও নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা সত্ত্বেও আলোচ্য চরিত্র ও যুগকে আদর্শায়িত করে দেখাবার চেষ্টা এ গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। দশ বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক জীবন-চরিত 'আল ফারুকে' এ প্রবণতা কিছুটা সংযত রূপ নিয়েছে কেননা খলিফা ওমরকে আবেগ উত্তেজনাময় রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে তিনি দেখেছেন, ভুল প্রমাদ যার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু, ওমরের প্রতি শিবলীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার স্বাক্ষর এ বইটির প্রতি ছত্রে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমকালীন ভারতের সরকারী পরিভাষায় ওমরের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার একটি সোৎসাহ

বর্ণনা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, লেখক শাসনব্যবস্থার ন্যায়বিচার, কর্মদক্ষতা ও সাম্যবাদের ওপর জোর দিয়েছেন, অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-আদর্শের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। শিবলীর আরও দুইটি জীবনীগ্রন্থ 'আল গাজ্জালী' ও 'সিরাতুন নোমানে'ও আদর্শায়িত ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কীর্তির ইতিহাস লেখার রীতি পালিত হয়েছে। 'আল ফারুক'কে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন এবং প্যান-ইসলামী উদ্দীপনার ফলেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'সিরাতুন নবী'ই তার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। এ গ্রন্থটির মাত্র দুইখণ্ড তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন ; পরে তাঁর শিষ্য সুলেমান নাদ্‌ভী, শিবলীর চিন্তাসূত্রকে অনুসরণ করে এটি সম্পূর্ণ করেন। শিব্‌লী ইতিহাসে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব স্বীকার করতেন কিন্তু স্যার সৈয়দের বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ প্রসূত বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে গভীর ধর্মীয় আদর্শবাদ মিলিয়ে তিনি সমতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। 'সিরাতুন নবী'তে হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁকে মানবতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন ; স্যার সৈয়দের 'খুত্‌বাত-এ- আহমদীয়া'র মত, ইয়োরোপীয় সমালোচনার জবাব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন মনে করেননি। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে মুসলিম ইতিহাসের ধারণা যেমন আমীর আলীর History of the Saracens ও Spirit of Islamকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ উর্দু পাঠকের মনও তেমনই শিব্‌লীর ঐতিহাসিক জীবনীগুলিকে আশ্রয় করেই গঠিত হয়েছে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'শের্‌-উল-আজম্‌', ফার্শি কাব্যের ইতিহাস। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরাও এর মৌলিকতার সুখ্যাতি করেছেন। এটিও কিন্তু জীবনীমূলক ; কাব্যের ভাব ও রীতি বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন কবির কাব্যজীবনের পর্যালোচনা।

পাঁচ

ইতিহাসের একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে মুসলিম জাহান, বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক কীর্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর সে কীর্তিকে আদর্শায়িত করে বর্ণনা করার অভ্যাস শিব্‌লীর দৃষ্টান্তে সমস্ত উর্দু ঐতিহাসিকদেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। যে দেশ বা জাতি ইসলামের রাজনৈতিক আওতায় আসেনি, উর্দু

লেখকদের চোখে তার কোন নিজস্ব গুরুত্ব নাই। মুসলমান প্রভাবিত দেশগুলির ইতিহাসও আবার ইসলামের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করা হয়, যেন তার পূর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতার কোনও উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বই ছিলনা। মুসলিম জাহানের ইতিহাসও কেবল মাত্র মুসলমানের শক্তি ও গৌরবের ইতিহাস, অবনতির বর্ণনা নয়। সে জন্য বাগদাদের আব্বাসীয়দের, স্পেনের ওমাইয়া খিলাফতের ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সভ্যতা ঐশ্বর্য নিয়ে উর্দুতে যত ঐতিহাসিক রচনা আছে, এদের পতনের যুগ নিয়ে লেখা রচনার সংখ্যা তত নয়। পতন বা অবনতির কথা এলেই, ইসলামের মূল আদর্শ বর্জন ও অনৈসলামিক আচার ব্যবহারের প্রসারকে সে পতনের জন্য দায়ী করা, আর তারই অনুসিদ্ধান্তের (corollaryর) মত, মধ্যযুগের মুসলমান শাসনপ্রণালী রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক মানের উৎকৃষ্টতায় অহেতুক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস, এই ইতিহাসগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্ব ইতিহাসের মানদণ্ডে মুসলমানের এই কার্যকলাপকে বিচার করার অনিচ্ছা এই বিশ্বাসেরই আর এক দিক। অ-মুসলিম, বিশেষ করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের, আইন কানুন, চিন্তারীতি, আচার অনুষ্ঠানে মর্যাদা যোগ্য কিছু থাকতে পারে, তা বিবেচনা করাও নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য প্রাচীন সভ্যতার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব এখন অনেকটা কমেছে, তবু উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তায় এ মনোভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর রচনায় তার পুনরাবির্ভাব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দেখা যায়। ঊনিশ শতকের শেষ দশকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত জাকাউল্লার 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান' উর্দু ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। এটিকে অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস না বলে ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বলাই উচিত। কারণ, এর আরম্ভ আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকেও নয়—একেবারে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব থেকেই, আর শেষ হয়েছে—সিপাহী বিদ্রোহ ও বাহাদুর শাহের নির্বাসনের সঙ্গে। উপক্রমণিকায়, ফার্শি ইতিহাসের রীতিতে, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহ ইতিহাস শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও নীতি শিক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় রীতি পালনের প্রকৃষ্ট নমুনা। ফার্শি ইতিবৃত্তের মত বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যের সঙ্কলনকেই ইতিহাস

হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তথ্যের অনুবদ্ধ ব্যাখ্যা বা নৈতিক মূল্যায়ন হিসাবে নয়। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয়-আড়ম্বর উৎসবে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত (minute and vivid) বর্ণনা রাজপুরুষদের আচরণে একান্ত মানোনিবেশ ঘটনার তুচ্ছতা উপেক্ষা করে ঘটনামূলক বেগবান কাহিনী রচনা করা প্রভৃতি ফার্শি ইতিহাসের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। আলাউদ্দিন খিলজী বা তৈমুরের নৃশংসতার মত মুসলমান রাজাদের নিন্দনীয় আচরণের কোনই সমালোচনা ত' নাই-ই বরঞ্চ তাদের দৃঢ়তা ও শত্রুদমনে দক্ষতার প্রশংসাই করা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের প্রতি জাকাউল্লার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা খুবই প্রকট; শরীয়ত পালনে সম্রাটের নিষ্ঠা ও সাহসের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিত এই ইতিহাসকে এতই সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরাজ কোম্পানী যে সর্বভারতীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল তার কোনও বিবরণ ত' নাই-ই, আভাসে-ইঙ্গিতেও তার উল্লেখ করা হয়নি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাতেও জাকাউল্লার ব্যক্তিকেন্দ্রিত অনুবীক্ষণি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। বাহাদুর শাহের নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা বা মুসলমান শক্তির এই চরম পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

জাকাউল্লার মানসিকতার আর একদিকের পরিচয় গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটা মূল্যায়ণ হিসাবে হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বের ফলে কী ভাবে উপকৃত হ'য়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসনব্যবস্থার কোনও সংবাদ তেমন জানা যায় না। তাঁর যুগে এ কথা আংশিক সত্য ছিল বটে, কিন্তু এ মন্তব্য করার পরই তিনি হিন্দু শাসন ব্যবস্থার একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে মুসলমান শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং উপসংহারে ফার্শি ঐতিহাসিকদের আত্মতৃপ্ত (self complacent) ভঙ্গিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, রীতি নীতি, আইনকানুন, শিল্পসাহিত্য, কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল না, আর থাক্‌লেও তা মুসলমানদের সাথে তুলনা করার যোগ্য নয়। কাজেই মুসলমান শাসনের ফলে যে ভারতবর্ষ সভ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।[৫] শিবলী নোমানিও তাঁর একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন: "অন্যের দেশ আক্রমণ করে দখল করা তেমন দোষের কথা নয়; আসলে, সভ্যতাবিস্তারের যোগ্যতা ও আগ্রহ দিয়েই বিজয়ীকে আমাদের বিচার করা উচিত।"[৬]

এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে এ ধারার প্রবর্তক ছিলেন সাংবাদিক আবদুল হালিম শরর। দুনিয়া থেকে মিথ্যা ও অসুন্দরকে দূর করে ন্যায়বিচার ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করতে, সাম্যবাদের পতাকাবাহী ইসলামের মহান প্রচেষ্টাই তাঁর উপন্যাসের মূল সুর। স্পেনে, ভারতবর্ষে ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের ক্ষাত্রশক্তি, মহত্ব ও সৌকর্যকে আদর্শায়িত করে দেখানোর উৎসাহে শরর কাহিনী বা চরিত্রাঙ্কনকেও উপেক্ষা করেছেন। ইনি সিন্ধুতে মুসলমান শাসনের একটি ইতিহাসও প্রণয়ন করেন। তার উপাদান বেশীর ভাগই Elliot এর সঙ্কলিত ইংরাজি ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছিল। এতে, জাকাউল্লার 'তারিখের' মত, বিভিন্ন বিবরণ ও সাক্ষ্যকে ফার্শি ইতিহাসের রীতি অনুযায়ী, অত্যন্ত যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করা হলেও ঘটনার মূল্যনিরূপণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে এবং সেজন্য এ রচনাটি উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজনা। নীতি প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকলেও শররের চিত্তবৃত্তি ছিল আসলে রোমান্টিক কাহিনী-কারের। সেজন্য লখনৌএর শেষ বাদশাহকে নিয়ে লেখা তার আর একটি রচনা 'মাশ্‌রেকি তামাদ্দুন কা আখরী বাহার্' এই পতনোন্মুখ রাজত্বের ইতিহাস না হয়ে ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারী ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি-চর্যার একটি আদর্শায়িত আবেগময় বর্ণনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছয়

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ভারতের ভাষাগুলির মত, উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যেও রাজনৈতিক আন্দোলন-সৃষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। প্যান্ ইসলামী আদর্শের টানে মুসলমানরা ক্রমেই ইংরাজবিরোধী ও মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য ইতিহাস থেকে এই দুই জাতির মধ্যে অতীত সৌহার্দ্যের প্রমাণ সংগ্রহ ও বিবরণ দেওয়া ঐতিহাসিকের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যে সব অতীত ঘটনা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, সেগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দেওয়া ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বলে গণ্য হোল। ইংরাজ যেহেতু মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র প্রতিবন্ধক হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার জন্য ইংরাজ লেখকদের দুরভিসন্ধিকে সেজন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত মনে ইতিহাসকে সময়ের তাগিদানুযায়ী ব্যাখ্যা করা

ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজ ছিল। চিন্তার প্রসার ও যুক্তি প্রমাণের সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এ যুগের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে এই সাময়িকতার ছাপ খুবই বেশী। তাছাড়া আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দি-উর্দু বিবাদ, নূতন ও পুরাতনপন্থী মুসলমানের চিরন্তন বিরোধ প্রভৃতি সাময়িক প্রশ্নের দরুন উর্দু-ভাষী মুসলমানের মনে যে জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ঐতিহাসিক চিন্তার লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিবলীর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিবার উৎসাহ দিয়ে তিনি ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌএর উর্দু 'মুসলিম গেজেটে' কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটিতে ইতিহাস থেকে মুসলমান বাদশাদের ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি হিন্দুদের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সহযোগিতার নজীর দেখিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদের বন্ধুত্বে আস্থা স্থাপন করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। চার বছর পরে, ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে এ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং আর একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁকে স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের আনুগত্যের মূলে তাদের উদারতার চেয়ে মুসলমান বাদশাদের সহৃদয় ব্যবহারই ছিল বেশী কার্যকরী।[১]

এ যুগের রচনাগুলিতে সাময়িকতার প্রতিফলন আর একদিক দিয়েও দেখা যায়। ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমকালীন কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার আগ্রহ লেখাগুলিতে স্পষ্ট। 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর একনজর' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত। এটি খিলাফত নেতা মওলানা মুহম্মদ আলীর অনুরোধক্রমে লেখা এবং যুক্তি ও তথ্যের গুণে উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। এতে আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস নাই। তাঁর যেসব কার্যের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ইংরাজ ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকরা বক্রোক্তি করে থাকে, এবং যা হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার করতে পারে, তারই এক তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও প্যান-ইসলামি জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই আওরঙ্গজেবকে বিচার করা হয়েছে। তাঁকে ভারতীয় নৃপতির চেয়ে মুসলমান বাদশা হিসাবে দেখার দরুন, শাসন কাজে শরীয়তের নীতি প্রতিষ্ঠা, দারা শুকোহের ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার বিরোধ, আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-নীতি বর্জন প্রভৃতি কয়েকটি কার্যের জন্য শিব্‌লী তাঁকে সমালোচনা করেন নি। যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁর হিতাকাঙ্খা ও

উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করেছেন মাত্র। বিশ্বমুসলিম সমাজের ভারতীয় শাখা, স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিল, আওরঙ্গজেবের নীতি তার পরিপন্থী ত নয়-ই, বরঞ্চ মুসলমানকে স্বধর্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত করার ফলে উভয়ের মধ্য দিয়ে যে সমতা বিধান করার চেষ্টা এ নীতির মূলে ছিল তার দরুন সে সূত্র আরও দৃঢ় হবারই কথা।[৮] শিব্‌লীর যুক্তিতে তাঁর সমকালীন ধর্মানুপ্রাণিত ইংরাজবিরোধী মুসলমান আন্দোলনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট।

সাত

খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তাবৃত্তির আরও স্বচ্ছতর প্যাটার্ন চোখে পড়ে। শিব্‌লীর চিন্তাধারা অবশ্য এ প্যাটার্নের ভিত্তি। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আজমগড়ের 'দারুল মুসান্নেফী'নের উদ্যোগে তাঁর শিষ্য ও সহকর্মী সুলেমান নাদ্‌ভী সে চিন্তার সূত্রগুলিকে আরও প্রসারিত করেন। ঐতিহাসিক হিসাবে উর্দু-সাহিত্যে শিব্‌লীর পরই সুলেমান নাদ্‌ভীর স্থান। উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যে শিব্‌লীর সবচেয়ে বড় দান এই যে তিনি মূল দলীল-দস্তাবেজগুলির উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা ও ব্যবহারের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। এ ধারা আজমগড় গোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছেন। এ'দের চিন্তায় শিব্‌লীর প্রভাব ত আছেই, ওহাবী মনোবৃত্তির রেশও দুর্লভ নয়; জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের দিকে ঐকান্তিক ঝোঁক তার দৃষ্টান্ত। মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতি যে ভারতের জীবনে প্রধানতঃ বিদেশাগত উপাদান, যার পৃথক সত্তার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দেশীয় উপাদানের তুল্য মর্যাদায় ও সহযোগিতায় হওয়ার দরকার, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা এই লেখক গোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এ'রা বিশ্বাসী ও সচেষ্ট কিন্তু বাঞ্ছিত পরিণতি হিসাবে এদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কল্পনা এ'দের চিন্তারীতির বিরোধী। এ'দের ঐতিহাসিক রচনাগুলি প্রধানতঃ সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে; রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনায় এ'দের উৎসাহ নাই। কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে পড়ে ভারতবর্ষকেও এ'রা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, নয়ত এ'দের ইতিহাসবোধ ভারতবর্ষ-সচেতন নয়। আরবী ইতিহাসপ্রণালী অনুসরণ করে জীবনী আকারে রচিত সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব

বিষয়ে এঁদের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি গবেষণার মৌলিকতা ও রচনাশৈলীর গুণে ইয়োরোপীয় Orientalistদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাসের সংখ্যা উর্দু ভাষায় বেশী নাই। ১৯৩৫ সাল থেকে এ মনোভাবের তেমন অকুণ্ঠ প্রকাশও দেখা যায় না। ১৯৩১ সালে সুলেমান নাদ্‌ভী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পুষ্ট করার জন্য "আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত" লিখেছিলেন, যাতে ভারতবর্ষ ও আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহাসিক নজীরগুলি মূল আরবী-ফার্শি থেকে সংগ্রহ করে হিন্দু মুসলমানকে সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়েছেন যখন এই দুই জাতি বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপক্রমণিকায়, হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য ইতিহাসের বিকৃতিকে দায়ী করে জাতীয় সংহতির কাজে ঐতিহাসিকের গুরু-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন।[৯] এখানে লক্ষণীয় যে, সুলেমান নাদ্‌ভী যে জাতীয়তার কথা বলেছেন তা কংগ্রেসের ধারণাসম্মত territorial জাতীয়তা নয়। এ জাতীয়তাবাদ হালীর ধারণাসম্মত, সেজন্য মুসলমান ও আরবের ইতিহাসকে অভিন্ন মনে করে ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলমানের ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা দেখান হয়েছে। অবশ্য ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবকে দৃঢ় করতে এ ধরণের প্যান-ইসলামী জাতীয়তাবাদ অবান্তর হয় নি। এই মনোভাবের সংক্রমণ আবদুল্লাহ্‌ ইয়ুসুফ আলী, আই. সি. এস. এর লেখা 'অংরেজি আহ্‌দ্‌ মে' হিন্দুস্থানী তাহজীবে'ও দেখা যায়, যাতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের উপর ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তাদের বিদ্বেষপ্রসূত বিবরণগুলির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। উর্দুতে ইয়ুসুফ আলীর আরও দুইটি ঐতিহাসিক রচনা আছে। কিন্তু গবেষণারীতির দিক দিয়ে এগুলি উর্দুর ব্যতিক্রম, কারণ বিভিন্ন ভাষা ও সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও তুলনামূলক বিচারভঙ্গির জন্য এগুলি ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাসেরই অন্তর্গত এবং ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকের রুচিগ্রাহ্য করেই এগুলি লেখা।

কংগ্রেসের ধারণাসম্মত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন হিন্দু লিখিত উর্দু ইতিহাসেও তেমন নাই। ১৯০৫ সালে লালা লাজপত রায় দুই খণ্ডে একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাতে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান অবদানের স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্ব প্রমাণের তেমন চেষ্টা নাই।

সে চেষ্টা পণ্ডিত সুন্দরলালের 'হিন্দুস্থান মে' অংরেজী হুকমাত্' নামিত ১৯৩২ সালের দিকে লেখা বইটিতে অতি আন্তরিকতার সাথে করা হয়েছে। তবে এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস হিসাবে তেমন সফল নয় ; এতে ইংরাজ শাসনের কংগ্রেসী ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাই যেন বেশী। ভারতের জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে আদর্শ করে ইতিহাস রচনার আরও সফল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়া কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেনের 'হিন্দুস্থান কি কওমী তাহজীব' নামক পুস্তকটিতে। ভারতের সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা বিচ্ছেদকারী বা স্বাতন্ত্র্যপন্থীর (disruptive or extraneous) নয়, বরং অনুপূরকের (complementray), এ কথার উপর জোর দিয়ে লেখা এই বইটি বোধ হয় আধুনিক উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক রচনা। মুসলমান ইতিহাসে বিতর্কের চিরন্তন কেন্দ্র সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এই গ্রন্থে নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই করা হয় নি। বরং তাঁকে অশোকের ন্যায় আদর্শবাদীরূপে দেখান হয়েছে, যিনি সস্তা অপ্রিয়তা উপেক্ষা করে তাঁর নিজের বিশ্বাসমতে ইসলামের নীতিকে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীর মত যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যুগের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিকতার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।[১০]

উর্দুর স্বাতন্ত্র্যবাদী ইতিহাসবোধ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছে যেমন, তেমন তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ও করেছে। আলীগড় আন্দোলনের চিন্তাধারায় যেসব উপাদানগুলি নেপথ্যে ছিল এবং শিব্‌লী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনায় যেগুলি ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছিল, স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতা তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জীবনধারার সাথে মুসলমানদের মৌলিক ও দুরতিক্রম্য পার্থক্য দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করা এ ঐতিহাসিকতার প্রধান উপজীব্য। হিন্দু সভ্যতা বা প্রাক্ মুসলিম ভারত সম্বন্ধে এর কোনও কৌতূহল বা শ্রদ্ধা নাই। এ ঐতিহাসিক চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে revivalismএর সুর পাওয়া যায় এবং ইতিহাসের বিচারে (judgement) ধার্মিকতাকে মানদণ্ড করার প্রবৃত্তি এর আর এক লক্ষণ। এ মনোবৃত্তি অনুযায়ী আওরঙ্গজেবই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট এবং আকবর ও দারা শুকোহ স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। স্বাতন্ত্র্যবাদী

ঐতিহাসিকরা অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষণারীতিতে শ্রদ্ধাশীল এবং ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে এঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৫২ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হাশিম ফরিদাবাদীর 'তারিখ্-এ-পাক্ ও হিন্দ্' নামক রচনাটি এই স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নাই বললেই চলে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা গোলাম বারীর 'কোম্পানী কী হুকুমাত্ হিন্দুস্থান মে" এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হলেও, আসলে এটি Lester Hutchinsonএর Nabobs of Indiaরই সার সঙ্কলন; নিজস্ব মননরীতির পরিচায়ক নয়।

টীকা

(১) হবিবুর রহমান শেরওয়ানি : 'ওয়াকার-এ-হায়াত'; আলীগড়, ১৯২৫, পৃঃ ৩৮২।

(২) হুসেন আলী ও কুদরত আলী সম্পাদিত 'মআসির-এ-তালিবী'; কলকাতা, ১৮১২। English tran. Charles Stewart; London, 1810. এ বইটির সে সময় ফরাসী ও জার্মাণ ভাষাতেও তরজমা হয়েছিল। লেখকের বৈশাখ, ১৩৪৭ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত "ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) Butt, Abdullah : Spirit and Substance of Urdu Prose under the Influence of Sir Syed Ahmad Khan; Lahore, p. 148. Syed Ahmad Khan: The Truth About the Khilafat (English tran.) Lahore. (revised ed.) p. 5.

(৪) 'আল-মামুন', ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪।

(৫) জাকাউল্লা: 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান', খণ্ড ১০, পৃঃ ১৪—১৯ দ্রষ্টব্য।

(৬) শিবলী নোমানি: 'মাকালাত': আজমগড়, ভাগ ৬, 'মোগল শাসনের সাংস্কৃতিক ফল' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৭) 'মাকালাত': ভাগ ৮ "মুসলমানোঁ কা পোলিটিকাল কার্‌ওয়াই" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

(৮) শিবলী নোমানি: 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর', পৃঃ ৭—৮।

(৯) সুলেমান নাদ্‌ভী: 'আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত'; এলাহাবাদ, ১৯৩১, ভূমিকা, পৃঃ ১।

(১০) আবিদ হোসেন: 'হিন্দুস্থান কী কওমী তাহ্‌জীব'; দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ২৫৯।